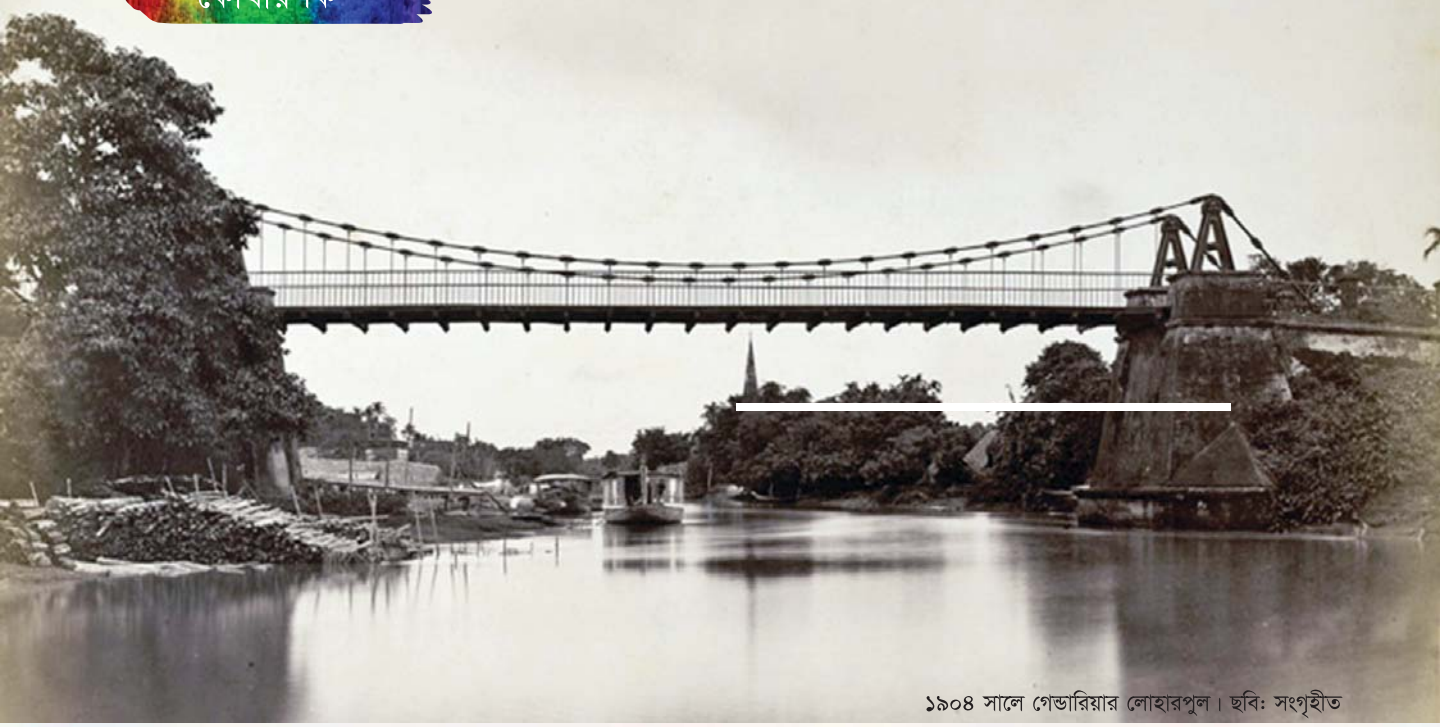

১৯০৪ সালে গেন্ডারিয়ার লোহারপুল। ছবি: সংগৃহীত

গেন্ডারিয়া: সুচিত্রা সেন থেকে সাধনা ঔষধালয়

হাসান নীল

বাদল দিনে বারান্দায় বসে গল্পে মেতে উঠতো এদেশের মানুষ। জোৎস্নারাতে জমিয়ে উপভোগ করতো পুঁথি পাঠ। তিন বেলা পেটে ভাত থাকলেই ঠিক। শিক্ষা-দীক্ষার সাথে অতটা ভাব ছিল না তাদের। কালে কালে এই সুযোগটাই লুফে নিয়েছে এ ভূখণ্ডে আসা দখলদার গোষ্ঠীরা। কখনও ভুলিয়ে কখনও চাপ দিয়ে প্রভুগিরি করেছে তারা। ব্রিটিশ, পাকিস্তানসহ অনেক নামই আছে এই তালিকায়। বিভিন্ন স্থাপনা বা নিদর্শনে নিজেদের চিহ্ন রেখে গেছে তারা। কল্যাণকর উদ্যোগ ও কুখ্যাতি দুটোই লেগে আছে তাতে। যুগে যুগে আসা বিদেশি প্রভুদের অতীত স্থাপনা, নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেশের আনাচ কানাচে। ঢাকা জেলার গেন্ডারিয়া থানাও এর ব্যতিক্রম নয়। কোনোটায় লেগে আছে দখলদারের ছোঁয়া, কোনোটায় বিপ্লবীদের। আবার কোনোটা জানান দিচ্ছে বিখ্যাত স্মৃতি।

জেনে নেওয়া যাক গেন্ডারিয়ার এসব ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর আদ্যপান্ত। তার আগে একটি চমকপ্রদ গল্প বলা যেতে পারে। এক ব্রিটিশ পরিব্রাজক একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলেন। বহতা ধোলাই নদীর ওপর শুয়ে থাকা লোহার পুলের কাছে এসে হঠাৎ লাগাম টানেন। উপভোগ করতে থাকেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মনোরম প্রকৃতি তাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে প্রশংসাসূচক বাক্য, 'হোয়াট এ গ্রান্ড এরিয়া'। এ বাক্যটিই বিকৃত হতে হতে 'গেন্ডারিয়া'য় রূপান্তরিত হয়। গবেষক ও ইতিহাসবেত্তারাও মনে করেন 'গ্রান্ড এরিয়া' থেকেই 'গেন্ডারিয়া' নামটি এসেছে। যদিও আরও একটি মত রয়েছে গেন্ডারিয়ার নামকরণ নিয়ে। সেসময় এই অঞ্চলে আখ চাষ হতো প্রচুর। অনেকে মনে করেন, ওই গেন্ডারি থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে গেন্ডারিয়া। এবার তাহলে জানা যাক কোথায় কী আছে গেন্ডারিয়ায়।

সীমান্ত গ্রন্থাগার

পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া বিখ্যাত 'সীমান্ত' পাঠাগারের জন্য। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট নেতা নাসিম আলীর হাত ধরে গড়ে উঠেছিল এই পাঠাগার। নিজ বাড়ির একটি ঘর থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরের বছর নিজস্ব ঠিকানা পায় গ্রন্থাগারটি। দীননাথ রোডের অম্বিকা চরণ চক্রবর্তীর পরিত্যক্ত বাড়িটি হয়ে ওঠে 'সীমান্ত'র নতুন ঠিকানা। এই গ্রন্থাগারে রয়েছে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের ছোঁয়া। প্রতিষ্ঠানটি মাথা তুলতে তাদের জোরালো ভূমিকা রয়েছে। দেশভাগের আগে আম্বিকা চরণের ওই বাড়ি হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের আস্তানা। এখানে আত্মগোপনে থেকেই সত্যেন সেন, জ্ঞান চক্রবর্তী, নেপাল নাগ, নিবেদিতা নাগের মতো বিপ্লবীরা নিজেদের কার্যক্রম চালাতেন। গোপন সভায় মিলিত হতেন। ফলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পায় গ্রন্থাগারটি। তখন থেকেই সীমান্ত গ্রন্থাগার গেন্ডারিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতো।

বিভিন্ন সময়ে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। এর মধ্যে লেখক-শিক্ষাবিদ ড. হায়াৎ মামুদ, সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার, আবেদ খান, সংগীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদ, অভিনেতা শওকত আকবর, আলী যাকেরের কথা বলা যেতে পারে। দেশের জনপ্রিয় লেখক ইমদাদুল হক মিলনের লেখক হয়ে উঠতে অবদান রেখেছে গ্রন্থাগারটি। সেকথা আজও স্বীকার করেন মিলন। এই পাঠাগারে বসেই তার ভেতর লেখক হওয়ার স্পৃহা মাথাচাড়া দিয়েছিল। মিলন তখন তরুণ। একদিন গ্রন্থাগারে বসে আপন মনে বই পড়ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল করলেন তাদেরই এক বড় ভাইকে ঘিরে সবার মনোযোগ। কারণ হিসেবে জানতে পারলেন, ওই বড় ভাইয়ের একটি কবিতা প্রকাশ পেয়েছে পত্রিকায়। তাই এতো সমাদর। ওই ঘটনা দেখে লেখক হওয়ার জেদ বেড়ে যায় মিলনের।

গেন্ডারিয়া রেল স্টেশন

গেন্ডারিয়ার স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম গেন্ডারিয়া রেল স্টেশন। এখানে হয়তো দর্শনার্থীদের আনন্দ দেওয়ার উপকরণ নেই। তবে এটি অতীত স্থাপনার একটি অংশ। গেন্ডারিয়া রেল স্টেশন নির্মাণ করা হয় ১৮৮৫ সালে। মূলত পাট ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে নির্মিত হয়েছিল। সোনালি আঁশের তখন বিশ্বব্যাপী চাহিদা। মোটা লাভের আশায় পাট নিয়ে ব্যবসায়ীরা কলকাতা যেতেন। ঢাকা ও ময়মনসিংহ থেকে পাট যেত কলকাতা বন্দরে। এজন্য ভরসা ছিল নদীপথ। যা ছিল অনেক

ঝক্কির। তাই যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করতে ময়মনসিংহ থেকে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত ১৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন তৈরি করা হয়। ওই সময় গেন্ডারিয়ায় স্থাপন করা হয় রেল স্টেশন।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের মতে যখন রেল স্টেশন হয় গেন্ডারিয়া ছিল শহরতলী। অল্প কিছু সংখ্যক লোকের বাস ছিল। তবে রেল স্টেশন হতেই বদলে যেতে থাকে গেন্ডারিয়ার চেহারা। ধীরে ধীরে ঢাকার অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে এটি। তার মতে, এই ট্রেনে সাধারণত চলাফেরা করতো ছাত্র, উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা। গেন্ডারিয়ার গেলে রেল স্টেশন ঘুরে আসতে পারেন। এক সময়ের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্রটি নিজ চোখে দেখতে পারেন।

পানির ট্যাংক

গেন্ডারিয়ায় যে পানির ট্যাংক দিয়ে গোটা শহরে পানি সরবরাহ করা হয় সেটির বয়স কত জানেন? ঢাকার প্রথম পানির ট্যাংক বসানো হয়েছিল ১৮৭৮ সালে। ধারনা করা হয় ওই সময়কালেই এটি স্থাপন করা হয়। গেন্ডারিয়ায় খোরশেদ মার্কেটের কাছে অবস্থিত এই ট্যাংকটিও ব্রিটিশ স্থাপনা।

গেন্ডারিয়া ব্যারাক

ব্রিটিশদের স্মৃতি নিয়ে বুড়িগঙ্গার তীরে আজও দাঁড়িয়ে আছে মিল ব্যারাক। একসময় ব্রিটিশ সৈনিকরা কুচকাওয়াজ করে নিজেদের গরিমা জানান দিত। তবে মিল ব্যারাকটি শুরুতে ছিল চিনি কল। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকের ঘটনা। সেসময় এক ব্রিটিশ ব্যক্তি চিনির কল স্থাপনের জন্য বেছে নেন বুড়িগঙ্গার তীরের সূত্রাপুর এলাকা। গড়ে তোলেন 'ঢাকা সুগার ওয়ার্কার্স কোম্পানি' নামে একটি চিনির কল। তবে তিনি কারখানাটি বেশিদিন চালাতে পারেননি। তিনি বন্ধ করে দিলে এটি কিনে নেন উইলিয়াম ফলি নামের আরেক ইংরেজ। মালিকানা বদলের সঙ্গে 'ঢাকা সুগার ওয়ার্কার্স কোম্পানি' হয়ে যায় 'ফ্লাসিস ফ্লাওয়ার মিল'। ফলি এটিকে ময়দার কারখানা বানান। কারখানাটি কেমন চলছিল সে কথা জানা গেলেও জানা গেছে ব্যারাকে পরিণত

হওয়ার কথা। ১৮৫৭-৫৮ সালে ভারতে শুরু হয় সিপাহি বিদ্রোহ। তার আঁচ লেগেছিল বঙ্গভূমিতেও। বিদ্রোহিদের দমনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সেনাদের পাঠানো হয় ঢাকায়। সেসময় সৈন্যদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয় ফলি'র ময়দার কলে। এক সময় বিদ্রোহ শেষ হয়। কিন্তু ব্যারাক হিসেবেই থেকে যায় ময়দার কলটি। বরং একে ঝেড়ে মুছে সংস্কার করে ব্যারাক হিসেবে ব্যবহারের আরও উপযোগী করে তোলা হয়। তখন থেকেই এটি পরিচিতি পায় মিল ব্যারাক নামে। পরে ১৮৬৭ ব্রিটিশ সরকার এটিকে ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে। পরিধি বাড়াতে আশেপাশের কিছু ইমারতও গ্রহণ করে।

সুচিত্রা সেনের শ্বশুরবাড়ি

গেন্ডারিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেনের নাম। গেন্ডারিয়ায় ছিল তার শ্বশুর বাড়ি। বলা যায়, গেন্ডারিয়াবাসীরা সুচিত্রা সেনের শশুরবাড়ির লোক। গেন্ডারিয়াকে আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন দীননাথ সেন। তিনি ছিলেন মানিকগঞ্জের জমিদার। পথচারীদের তার নাম আজও মনে করিয়ে দেয় দীননাথ রোড। দীননাথ সেনের নাতি দিবাকর সেনের সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন সুচিত্রা সেন। বিয়ের পর কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন জমিদার বাড়িতে। গেন্ডারিয়া গেলে দেখে আসতে পারেন গেন্ডারিয়ার ২৭ নাম্বার রোডের হাই স্কুল। এই স্কুলটি ছিল দীননাথের জমিদার বাড়ি, যা পরে স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

সাধনা ঔষধালয়

সুচিত্রা সেনের শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুটা এগিয়েই দেখতে পাওয়া যাবে ব্রিটিশ আমলের একাধিক স্থাপনা। সেইসঙ্গে রয়েছে শতবর্ষ পুরানো ইমারত, মসজিদ, মন্দির। এর অদূরেই একটি লোহার ব্রিজ। ব্রিজটি নেই, তবে নাম এখনও রয়ে গেছে। গেন্ডারিয়ার নামকরণের যে মতটি সর্বজনগ্রাহ্য সেই গল্পের ইংরেজ ব্যক্তিটি ঘোড়া ছুটিয়ে এই ব্রিজের ধারে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন, হোয়াট এ গ্রান্ড এরিয়া। লোহার পুলটির নিচ দিয়ে সেসময় বয়ে যেত ধোলাই নদী। যা পরে নাব্যতা হারাতে হারাতে ধোলাই খালে পরিচিত। ধোলাই নদীর যৌবনকালে তার বুকে চলতো বড় বড় বজরা নৌকা।

এসব ফেলে দীননাথ সড়ক ধরে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই চোখে পড়বে সাধনা ঔষধালয়ের কারখানা। উপমহাদেশের বিখ্যাত আয়ুর্বেদ ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এটি। তবে এটি শুধু প্রতিষ্ঠান নয়। সাধনার এই কারখানাটি পাকিস্তানি হানাদারদের নিষ্ঠুরতার একটি দলিল। সাধনার কর্ণধার আয়ুর্বেদ বিশারদ ও শিক্ষাবিদ শহীদ অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ একজন মানবিক হৃদয়ের মানুষ। সাধনার ওষুধের বোতলে যে ভদ্রলোকের ছবি দেখা যায় তার কথাই বলছিলাম। তিনি ছিলেন অসহায় দুঃস্থদের শেষ আশ্রয়স্থল। তার কাছ থেকে খালি হাতে ফিরতো না কেউ। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার কাছে তিনি ছিলেন দেবতার মতো, আবার ঋণগ্রস্থের কাছে ছিলেন ভরসার নাম আর ভিটামাটি হারানো ব্যক্তির ছিলেন মাথার ওপরে ছাদ। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনি এই কারখানায় গুলি করে হত্যা করে তাকে। চাইলে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারতেন যোগেশচন্দ্র। কিন্তু দেশের মাটি ছেড়ে পালাতে রাজি ছিলেন না। দেশের প্রতি ভালোবাসায় হায়েনার ছোড়া বুলেটে প্রাণ ত্যাগ করেন তিনি।